যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন, ঈদ, কুরবানি ও আইয়ামে তাশরীকের দিনসমূহ

[বাংলা– Bengali – بنغالي]

জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013-1434

IslamHouse.com

عشر ذي الحجة، الأضحية، عيد الأضحى وأيام التشريق

« باللغة البنغالية »

ذاكرالله أبو الخير

مراجعة:د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1434

IslamHouse.com

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدُ للهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُـوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তার কাছেই সাহায্য চাই, তার নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও আমাদের কর্মসমূহের ক্ষতি থেকে আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন, তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই। আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে হেদায়াত দেওয়ার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরিক নাই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার উপর, তার পরিবার-পরিজন ও তার সাহাবীদের উপর এবং যারা কিয়ামত অবধি কল্যাণের সাথে তাদের অনুসরণ করেন তাদের উপর।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় বান্দাদের প্রতি অধিক দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তিনি তার বান্দাদের যে কোনো উপায়ে ক্ষমা করতে ও

তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পছন্দ করেন। এ কারণেই আল্লাহ বান্দাদের জন্য বিভিন্ন আমলের বিনিময় অগণিত অসংখ্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তাদের আমল করার সুযোগ দিয়ে তাদের নাজাতের ব্যবস্থা করেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা রমজান মাসকে স্বীয় বান্দাদের জন্য রহমত ও মাগফিরাতের মাস হিসেবে নির্বাচন করেছেন। আবার রমজান মাসের শেষ দশ দিনকে আরও বেশি গুরুত্ব দেন। আবার শেষ দশ দিনের মধ্যে এমন একটি রাত রেখেছেন যে রাতের ইবাদত হাজার রাতের ইবাদতের চেয়ে উত্তম বলে ঘোষণা দেন। রমজান মাসের রোজা রাখাকে জাহান্নাম থেকে বাচার ডাল স্বরূপ বলা হয়েছে এবং আশুরার রোজা রাখলে এক বছরের গুনাহ মাপের ঘোষণা দিয়েছেন এবং আরাফার দিবসের রোজা রাখাতে পূর্বের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ মাফের ঘোষণা দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ দেখিয়ে তাদের কোনো না কোনো উপায়ে জান্নাত লাভের পথকে সহজ করেছেন। যাতে বান্দাগণ আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হন। এ ধরনের একটি মৌসুম হল, যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন ও তার পরবর্তী তাশরীকের

দিনসমূহ। আল্লাহ তা‘আলার অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি নেককার বান্দাদের জন্য এ মৌসুমে স্বীয় বান্দাদের জন্য নেক আমল করার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং দিনগুলোতে যে কোনো ধরনের নেক আমল করা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সুযোগটি একজন বান্দার দীর্ঘ জীবনে বারবার আসে আর যায়। সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে আল্লাহর দেওয়া সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ধন্য হতে পারে। আর দুর্ভোগ ও হতাশা তাদের জন্য এ সুযোগ পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারেনি। নিজের ইহকাল ও পরকালের জীবনের জন্য কোনো কিছুই উপার্জন করতে পারে নি।

ইবাদতের মৌসুমগুলো আমরা কিভাবে গ্রহণ করব?

প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে, ইবাদতের মৌসুমগুলোতে বেশী বেশী তাওবা করা। গুনাহ ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা। কারণ, গুনাহ মানুষকে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত রাখে। গুনাহ ব্যক্তির অন্তর ও আল্লাহর মাঝে বাধার সৃষ্টি করে। বান্দার আরও উচিত শুভদিনগুলোতে কল্যাণকর কাজ ও এমন সব আমলে নিয়োজিত থাকা, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সহায়ক হয়। যে আল্লাহর পথে চেষ্টা

মুজাহাদা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য হেদায়াতের সব পথ খুলে দেবেন। তিনি বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ ٦٩ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

"আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমরা অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব"।[1]

তিনি অন্যত্র বলেন:

﴿ ۞وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣ ﴾ [ال عمران: ١٣٣]

"আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে"।[2]

হে মুসলিম ভাই, এ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর জন্য সজাগ থাকুন, তার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখুন, তা যেন কোনভাবেই আপনার থেকে অবহেলায় অতিবাহিত না হয়। অন্যথায় আপনি এমন দিন লজ্জিত হবেন, যে দিনের লজ্জা আপনার কোনো কাজে আসবে না। কারণ,

---

[1] আনকাবূত, আয়াত: ৬৯

[2] আলে-ইমরান, আয়াত: ১৩৩

দুনিয়া ছায়ার ন্যায়; এর কোনো স্থায়িত্ব নাই। আজ আমরা আমাদের স্বীয় কর্মস্থলে অবস্থান করছি আগামীকাল অবস্থান নাও করতে পারি। আমাকে সব সময় এ চিন্তা করতে হবে, প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশের দিবসে, আমার গন্তব্য কোথায় হবে, জান্নাত নাকি জাহান্নাম। এ জন্য তোমাকে এ দুনিয়া থেকে আমলের পুঁজি সঞ্চয় করতে হবে। তাদের মত হয়ো না যারা নিজের জন্য যা কল্যাণ সে সম্পর্কে অমনোযোগী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمۡ أَنفُسَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١٩ ﴾ [الحشر: ١٩]

“তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল ফলে আল্লাহও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছিলেন; আর তারাই হল ফাসিক”।[3]

তুমি তাদের মত হও, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ ٩٠﴾ [الانبياء: ٩٠]

[3] সূরা হাসর, আয়াত: ১৯

“তারা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতিসহ ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী”।[4]

যিলহজ মাসের ১ম দশ দিনের ফযিলত:

১. যিলহজ মাসের ১ম মাসের প্রথম দশদিন আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পরকালের পুঁজি সঞ্চয় করা যেতে পারে। এ দিনগুলো গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَٱلۡفَجۡرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشۡرٖ ۝٢ ﴾ [الفجر: ١، ٢]

“কসম ভোরবেলার। কসম দশ রাতের”।[5] ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য যিলহজ মাসের দশ দিন।

২. আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ ۝٢٨ ﴾ [الحج: ٢٨]

‘যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিজিক হিসেবে দান

---

[4] সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৯০

[5] সূরা ফাজর, আয়াত: ১-২

করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।[6]’

এ আয়াতে নির্দিষ্ট দিনসমূহ বলতে কোনো দিনগুলোকে বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে ইমাম বুখারি রহ. বলেন,

قال ابن عباس: أيام العشر

“ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন: ‘নির্দিষ্ট দিনসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন”। বিশিষ্ট সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.

[رواه البخاري، والترمذي واللفظ له]

যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনে নেক আমল করার মত অধিক প্রিয় আল্লাহর নিকট আর কোনো আমল নেই। তারা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদ করাও কি তার চেয়ে প্রিয় নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না, আল্লাহর

---

[6] সূরা হজ, আয়াত: ২৮

পথে জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তির কথা আলাদা যে তার জান-মাল নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয়ে গেল অতঃপর তার প্রাণ ও সম্পদের কিছুই ফিরে এলো না।[7]

৪. ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট কোনো দিন অধিক প্রিয় নয়, আর না তাতে আমল করা, এ দিনের তুলনায়। সুতরাং, তাতে তোমরা বেশি করে তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ কর।[8]

৫. সাঈদ ইবনে জুবায়ের রাহিমাহুল্লাহর অভ্যাস ছিল, যিনি পূর্বে বর্ণিত ইবনে আব্বাসরে হাদিস বর্ণনা করেছেন: যখন যিলহজ মাসরে ১ম দশ দিন প্রবেশ করত, তখন তিনি খুব মুজাহাদা করতেন, যেন তার উপর তিনি শক্তি হারিয়ে ফেলবেন।[9]

৬. ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: যিলহজ মাসের দশ দিনের ফযিলতের তাৎপর্যের ক্ষেত্রে যা স্পষ্ট, তা হচ্ছে এখানে মূল

---

[7] বুখারি: ৯৬৯, তিরমিযি: ৭৫৭

[8] তাবরানী ফীল মুজামিল কাবীর

[9] দারামী: ২৫৬৪ হাসান সনদে

ইবাদতগুলোর সমন্বয় ঘটছে। অর্থাৎ সালাত, সিয়াম, সদকা ও হজ, যা অন্যান্য সময় আদায় করা হয় না।[10]

৭. উলামায়ে কেরাম বলেছেন: যিলহজ মাসরে ১ম দশদিন সর্বোত্তম দিন, আর রমযান মাসের শেষ দশ রাত, সব চেয়ে উত্তম রাত।

এ দিনগুলোতে যেসব আমল করা মোস্তাহাব:

১. তাওবা: তাওবা অর্থ ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহ **তা'আলা**র নাফরমানি থেকে ফিরে আসা, আল্লাহর হুকুমের পাবন্দি করার উপর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা এবং অতীতের কৃত কর্মের উপর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে তা ছেড়ে দেওয়া এবং ভবিষ্যতে আর কখনো আল্লাহর নাফরমানি না করা ও তার হুকুমের অবাধ্য না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করা। এ দিন গুলোতে তাওবা করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার একটি সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى

[10] ফাতহুল বারী ১/২৬৩

ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥۖ نُورُهُمۡ يَسۡعَىٰ بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَبِأَيۡمَٰنِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ۝٨ ﴾ [التحريم: ٨]

'হে মোমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর—বিশুদ্ধ তওবা; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সে দিন আল্লাহ লজ্জা দেবেন না নবীকে এবং তার মোমিন সঙ্গীদেরকে, তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[11]

২. ফরয ও নফল সালাতগুলো গুরুত্বের সাথে আদায় করা: অর্থাৎ ফরয ও ওয়াজিবসমূহ সময়-মত সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, যেভাবে আদায় করেছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সকল ইবাদতসমূহ তার সুন্নত, মোস্তাহাব ও আদব সহকারে আদায় করা। ফরয সালাতগুলো সময় মত সম্পাদন করা, বেশি বেশি করে নফল সালাত আদায় করা। যেহেতু এগুলোই

[11] সূরা তাহরীম, আয়াত: ৮

আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার সর্বোত্তম মাধ্যম। সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি **বলেন:** আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: তুমি বেশি বেশি সেজদা কর, কারণ তুমি এমন যে কোনো সেজদাই কর না কেন তার কারণে আল্লাহ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করবেন। [মুসলিম] এটা সব সময়রে জন্য প্রযোজ্য। নিয়মিত ফরয ও ওয়াজিবসমূহ আদায়ে যত্নবান হওয়া- অর্থাৎ, ফরয ও ওয়াজিবসমূহ সময়-মত সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। যেভাবে আদায় করেছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সকল ইবাদতসমূহ তার সুন্নত, মোস্তাহাব ও আদব সহকারে আদায় করা। হাদিসে এসেছে—

عن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إن الله تعالى قال: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي

لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ، يكره الموت وأنا أكره مساءته». رواه البخاري

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার কোনো অলির সঙ্গে শত্রুতা রাখে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা ফরয ইবাদতের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোনো ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারাই সর্বদা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয়পাত্র বানিয়ে নেই, আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে আমার কাছে কোনো কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায় আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দেই। আমি যে কোনো কাজ করতে চাইলে তাতে কোনো রকম দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মুমিন বান্দার প্রাণ হরণে। সে

মৃত্যুকে অপছন্দ করে থাকে অথচ আমি তার প্রতি কষ্টদায়ক বস্তু দিতে অপছন্দ করি।’[12]

৩. **সিয়াম পালন-রোজা রাখা:** যিলহজ মাসরে প্রথম দশ **দিনের** রোজা রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। যেহেতু অন্যান্য নেক আমলরে মধ্যে সিয়ামও অন্যতম, তাই এ দিনগুলোতে খুব যত্নসহকারে সিয়াম পালন করা।

عن حفصة- رضى الله عنها- قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي- صلى الله عليه وسلم-: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة . رواه أحمد، والنسائي صحيح سنن أبي داود، صحيح سنن النسائي

হাফসা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো চারটি আমল পরিত্যাগ করেননি। সেগুলো হল: আশুরার সওম, যিল হজের দশ দিনের সওম, প্রত্যেক মাসে তিন দিনের সওম, ও জোহরের পূর্বের দুই রাকাত সালাত।[13]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً »

---

[12] বুখারি, হাদিস: ৬৫০২

[13] আহমদ: ৬/২৮৭, আবু দাউদ: ২১০৬, নাসায়ী: ২২৩৬

“যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোজা রাখবে, একদিনের রোজার বিনিময় তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর খারিফ দূরে রাখবে”[14]।

৪. হজ ও ওমরা করা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুটি মর্যাদাপূর্ণ ইবাদতের জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। এ দুটি ইবাদতে রয়েছে পাপের কুফল থেকে আত্মার পবিত্রতা, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় ও সম্মানিত হতে পারে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:—

«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه »

‘যে ব্যক্তি হজ করেছে, তাতে কোনো অশ্লীল আচরণ করেনি ও কোনো পাপে লিপ্ত হয়নি সে সে দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে গেল, যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছে।’[15]

হাদিসে আরও এসেছে—

عن أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجـنة ».

---

[14] বুখারী, ২৮৪০; মুসলিম: ১১৫৩।

[15] বুখারি: ১৪৪৯, মুসলিম: ১৩৫০

رواه البخاري ، ومسلم

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'এক ওমরাহ থেকে অন্য ওমরাহকে তার মধ্যবর্তী পাপসমূহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর কলুষযুক্ত হজের পুরস্কার হল জান্নাত।'[16]

৫. আল্লাহর যিকির করা:

এ দিনসমূহে অন্যান্য আমলের মাঝে যিকিরের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, যেমন হাদিসে এসেছে:—

عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- عن النبى- صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ».[رواه أحمد، وقال أحمد شاكر:إسناده صحيح]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এ দশ দিনে [নেক] আমল করার চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে অধিক প্রিয় ও মহান আর কোনো আমল নেই। তোমরা এ সময়ে তাহলীল [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ] তাকবীর

---

[16] বুখারি: ১৬৮৩, মুসলিম: ১৩৪৯

[আল্লাহু আকবার] তাহমীদ [আল-হামদুলিল্লাহ] বেশি করে আদায় কর।[17] আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন:—

﴿ لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ ٢٨ ﴾ [الحج: ٢٨]

'যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিজিক হিসেবে দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।'[18]

অধিকাংশ আলেম বলেছেন: এ আয়াতে নির্দিষ্ট দিন বলতে যিলহজের প্রথম দশ দিনকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ সময়ে আল্লাহর বান্দাগণ বেশি বেশি করে আল্লাহর প্রশংসা করেন, তার পবিত্রতা বর্ণনা করেন, তার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেন, কুরবানির পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম ও তাকবীর উচ্চারণ করে থাকেন।

---

[17] আহমদ, হাদিস: ১৩২

[18] সূরা আল-হজ, আয়াত: ২৮

হাদিসে আছে চারটি বাক্য আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। ১-সুবহানাল্লাহ, ২-আলহামদু লিল্লাহ, ৩-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ৪-আল্লাহু আকবর। এ দিনগুলোতে এ যিকিরগুলো করা যেতে পারে।

৬. তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ:

এ দিনগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মহত্ত্ব ঘোষণার উদ্দেশ্যে তাকবীর পাঠ করা সুন্নত। এ তাকবীর প্রকাশ্যে ও উচ্চস্বরে মসজিদ, বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, বাজার সহ সর্বত্র উচ্চ আওয়াজে পাঠ করা হবে। তবে মেয়েরা নিম্ন-স্বরে তাকবীর পাঠ করবে। তাকবীর হল:—

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَاإِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الحَمْدُ

সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. ও আবু হুরাইরা রা. যিলহজ মাসের প্রথম দশকে বাজারে যেতেন ও তাকবীর পাঠ করতেন, লোকজনও তাদের অনুসরণ করে তাকবীর পাঠ করতেন। অর্থাৎ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই দুই প্রিয় সাহাবি লোকজনকে তাকবীর পাঠের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।[19]

---

[19] বুখারি, ঈদ অধ্যায়

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ইবনে ওমর ও আবূহুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ দশ দিন তাকবীর বলতে বলতে বাজারের জন্য বের হতেন, মানুষরাও তাদরে দেখে দেখে তাকবীর বলত। তিনি আরও বলেছেন, ইবনে ওমর মিনায় তার তাবুতে তাকবীর বলতেন, মসজিদের লোকেরা শুনত, অতঃপর তারা তাকবীর বলত এবং বাজারের লোকেরাও তাদের সাথে তাকবীর বলত। এক পর্যায়ে পুরো মিনা তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠত।

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দিনগুলোতে মিনায় তাকবীর বলতেন, প্রত্যেক সালাতের পর, বিছানায়, তাঁবুতে মজলিসে ও চলার পথে সশব্দে তাকবীর বলা মোস্তাহাব। যেহেতু ওমর, ইবনে ওমর ও আবূহুরায়রা সশব্দে তাকবীর বলেছেন।

৭. আরাফার দিন রোজা রাখা: হজ পালনকারী ছাড়া অন্যদের জন্য আরাফার দিন রোজা রাখা। আবু কাতাদাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফার **দিনের** রোজা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা **হলে** তিনি **বলেন,**

«احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده » .[رواه مسلم]

আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী, ইহা পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছররে গুনাহর কাফফারা হবে।[20]

৮. কুরবানির দিন তথা দশ তারিখের আমল:

কুরবানির দিনের ফযিলত

[১] এ দিনের একটি নাম হল ইয়াওমুল হজ্জিল আকবর বা শ্রেষ্ঠ হজের দিন। যে দিনে হাজীগণ তাদের পশু যবেহ করে হজকে পূর্ণ করেন। হাদিসে এসেছে:—

عن ابن عمر- رضى الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر: [أي يوم هذا] ؟ قالوا: يوم النحر، قال: «هذا يوم الحج الأكبر».رواه أبو داود وصححه الألباني

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির দিন জিজ্ঞেস করলেন এটা কোনো দিন? সাহাবিগণ উত্তর দিলেন এটা ইয়াওমুন্নাহার বা কুরবানির দিন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এটা হল ইয়াওমুল হজ্জিল আকবর বা শ্রেষ্ঠ হজের দিন। [আবু দাউদ: ১৯৪৫, আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।]

---

[20] মুসলিম: ১১৬৩

[২] কুরবানির দিনটি হল বছরের শ্রেষ্ঠ দিন। হাদিসে এসেছে—

عن عبد الله بن قرط عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى: يوم النحر ثم يوم القر.» رواه أبو داود وصححه الألباني

আব্দুল্লাহ ইবনে কুরত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর নিকট দিবসসমূহের মাঝে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন হল কুরবানির দিন, তারপর পরবর্তী তিনদিন।[21]

এ দিনগুলোর ব্যাপারে অনেক মুসলিমই গাফেল, অথচ অনেক আলেমের মতে নিঃশর্তভাবে এ দিনগুলো উত্তম, এমনকি আরাফার দিন থেকেও। ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম দিন, নহরের দিন। আর তাই হল হজ্জে আকবারের দিন। যেমন সুনানে আবূ দাউদে রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় দিন হল নহরের দিন, অতঃপর মিনায় অবস্থানের দিন। অর্থাৎ এগারতম দিন। কেউ কেউ বলেছেন: আরাফার দিন তার থেকে উত্তম। কারণ, সে দিনের সিয়াম দুই বছরের গুনাহের কাফফারা। আল্লাহ আরাফার

---

[21] আবু দাউদ: ১৭৬৫

দিন যে পরিমাণ লোক জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন, তা অন্য কোনো দিন করেন না। আরও এ জন্যও যে, আল্লাহ তা'আলা সে দিন বান্দার নিকটবর্তী হন এবং আরাফায় অবস্থানকারীদের নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন। তবে প্রথম বক্তব্যই সঠিক: কারণ, হাদিস তারই প্রমাণ বহন করে, এর বিরোধী কিছু নেই। যাই হোক, উত্তম হয় আরাফার দিন নতুবা মিনার দিন, হাজী বা বাড়িতে অবস্থানকারী সবার উচিত সে দিনের ফযিলত অর্জন করা এবং তার মুহুর্তগুলো থেকে উপকৃত হওয়া।

৯. কুরবানি করা:

কুরবানি কাকে বলে?

কুরবানি বলা হয় ঈদুল আজহার দিনগুলোতে নির্দিষ্ট প্রকারের গৃহপালিত পশু আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের লক্ষে যবেহ করা।

ইসলামি শরিয়তে এটি ইবাদত হিসেবে সিদ্ধ, যা কোরআন, হাদিস ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত্য দ্বারা প্রমাণিত। কোরআন মজীদে যেমন এসেছে:—

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢ ﴾ [الكوثر: ٢]

‘তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর ও (পশু) নাহর (কুরবানি) কর।’[22]

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٦٣ ﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

‘বল, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তার কোনো শরিক নাই এবং আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।’[23]

হাদিসে এসেছে:—

عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين ». [روه البخاري ومسلم]

বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ঈদের সালাতের পর কুরবানির

---

[22] সূরা কাউছার, আয়াত: ২

[23] সূরা আন'আম, আয়াত: ১৬২, ১৬৩

পশু যবেহ করল তার কুরবানি পরিপূর্ণ হল ও সে মুসলিমদের আদর্শ সঠিকভাবে পালন করল।[24]

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما [رواه البخاري ومسلم] وفي لفظ البخاري أقرنين قبل أملحين.

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে দুটি সাদা কালো বর্ণের দুম্বা কুরবানি করেছেন। তিনি বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবর বলেছেন। তিনি পা দিয়ে দুটো কাঁধের পাশ চেপে রাখেন।[25] তবে বুখারিতে 'সাদা-কালো' শব্দের পূর্বে 'শিং ওয়ালা' কথাটি উল্লেখ আছে।

কুরবানির হুকুম:

কুরবানির হুকুম কি? ওয়াজিব না সুন্নত? এ বিষয়ে ইমাম ও ফকীহদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে এবং তাদের দুটো মত রয়েছে।

প্রথম মত: কুরবানি ওয়াজিব। ইমাম আওযায়ী, ইমাম লাইস, ইমাম আবু হানীফা রহ. প্রমুখের মত এটাই। আর ইমাম মালেক ও

---

[24] বুখারি: ৫৫৪৫, মুসলিম: ১৯১৬

[25] বুখারি: ৫৫৬৫, মুসলিম: ১৯৬৬

ইমাম আহমদ রহ. থেকে একটি মত বর্ণিত আছে যে তারাও ওয়াজিব বলেছেন।

দ্বিতীয় মত: কুরবানি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এটি অধিকাংশ আলেমের মত এবং ইমাম মালেক ও শাফেয়ী রহ.-এর প্রসিদ্ধ মত। কিন্তু এ মতের প্রবক্তারা আবার বলেছেন: সামর্থ্য থাকা অবস্থায় কুরবানি পরিত্যাগ করা মাকরূহ। যদি কোনো জনপদের লোকেরা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সম্মিলিতভাবে কুরবানি পরিত্যাগ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। কেননা, কুরবানি হল ইসলামের একটি শি'য়ার বা মহান নিদর্শন।

যারা কুরবানি ওয়াজিব বলেন তাদের দলিল:

[এক] আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন:—

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢ ﴾ [الكوثر: ٢]

'তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং (পশু) কুরবানি কর।' [সূরা কাউছার, আয়াত: ২] আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশ পালন ওয়াজিব।

[দুই] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:—

«من وجد سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا ». رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم.

‘যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহের ধারে না আসে।’[26]

যারা কুরবানি পরিত্যাগ করে তাদের প্রতি এ হাদিস একটি সতর্ক-বাণী। তাই কুরবানি ওয়াজিব।

[তিন] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:—

«يا أيها الناس: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية ». . رواه أحمد وابن ماجه، حسنه الألباني

হে মানব সকল ! প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্ব হল প্রতি বছর কুরবানি দেয়া।[27]

আর যারা কুরবানি দেওয়া সুন্নত বলেন তাদের দলিল হচ্ছে:

[এক] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:—

«إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره، حتى يضحي ». رواه مسلم

---

[26] আহমদ, ইবনু মাজাহ: ৩৫১৬

[27] ইবনু মাজাহ: ৩১২৫

‘তোমাদের মাঝে যে কুরবানি করতে চায়, যিলহজ মাসের চাঁদ দেখার পর সে যেন কুরবানি সম্পন্ন করার আগে তার কোনো চুল ও নখ না কাটে।’[28]

এ হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ‘যে কুরবানি করতে চায়’ কথা দ্বারা বুঝে আসে এটা ওয়াজিব নয়।

[দুই] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের মাঝে যারা কুরবানি করেনি তাদের পক্ষ থেকে কুরবানি করেছেন। তার এ কাজ দ্বারা বুঝে নেয়া যায় যে কুরবানি ওয়াজিব নয়।

শাইখ ইবনে উসাইমীন রহ. উভয় পক্ষের দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করার পর বলেন: এ সকল দলিল-প্রমাণ পরস্পর বিরোধী নয় বরং একটা অন্যটার সম্পূরক।

সারকথা হল যারা কুরবানিকে ওয়াজিব বলেছেন তাদের প্রমাণাদি অধিকতর শক্তিশালী। আর ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মত এটাই[29] আর বর্তমান কালের শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ উসাইমীন এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

কুরবানির ফযিলত

---

[28] মুসলিম: ১৯৭৭

[29] মাজমূ ফাতাওয়া ৩২/১৬২-১৬৪।

[ক] কুরবানি দাতা নবী ইবরাহিম আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ বাস্তবায়ন করে থাকেন।

[খ] পশুর রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে কুরবানি দাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য অর্জন করেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন:—

﴿لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾﴾ [الحج : ٣٧]

'আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না তাদের গোশত এবং রক্ত বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদের পথ-প্রদর্শন করেছেন; সুতরাং আপনি সুসংবাদ দিন মুহসিনদেরকে।'[30]

[গ] পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও অভাবীদের আনন্দ দান। আর এটা অন্য এক ধরনের আনন্দ যা কুরবানির গোশতের পরিমাণ টাকা যদি আপনি তাদের সদকা

---

[30] সূরা হজ, আয়াত: ৩৭

দিতেন তাতে অর্জিত হত না। কুরবানি না করে তার পরিমাণ টাকা সদকা করে দিলে কুরবানি আদায় হবে না।

কুরবানির শর্তাবলি:

[১] এমন পশু দ্বারা কুরবানি দিতে হবে যা শরিয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেগুলো হল উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা। এ গুলোকে কুরআনের ভাষায় বলা হয় ‘বাহীমাতুল আন‘আম।’ যেমন, আল্লাহ বলেন:—

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ ﴿٣٤﴾ ﴾ [الحج : ٣٤]

‘আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি; তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলোর উপর যেন তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।’[31] হাদিসে এসেছে:—

عن جابر- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن.** [رواه مسلم]

[31] সূরা হজ, আয়াত: ৩৪

জাবের রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা অবশ্যই এক বছরের বয়সের ছাগল কুরবানি করবে। তবে তা তোমাদের জন্য দুষ্কর হলে ছয় মাসের মেষ-শাবক কুরবানি করতে পার"।[32] আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ছাড়া অন্য কোনো জন্তু কুরবানি করেননি ও কুরবানি করতেও বলেননি। তাই কুরবানি শুধু এগুলো দিয়েই করতে হবে। ইমাম মালিক রহ.-এর মতে কুরবানির জন্য সর্বোত্তম জন্তু হল শিং ওয়ালা সাদা-কালো দুম্বা। কারণ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের দুম্বা কুরবানি করেছেন বলে বুখারি ও মুসলিমের হাদিসে এসেছে। উট ও গরু-মহিষে সাত ভাগে কুরবানি দেয়া যায়। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن جابر- رضى الله عنه- أنه قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

জাবের রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমরা হুদাইবিয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তখন আমরা উট ও গরু দ্বারা সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানি দিয়েছি।'[33]

---

[32] মুসলিম, হাদিস: ১৯৩৬

[33] ইবনে মাজাহ্: ৩১৩২

গুণগত দিক দিয়ে উত্তম হল কুরবানির পশু হৃষ্টপুষ্ট, অধিক গোশত সম্পন্ন, নিখুঁত, দেখতে সুন্দর হওয়া।

[২] শরিয়তের দৃষ্টিতে কুরবানির পশুর বয়সের দিকটা খেয়াল রাখা জরুরি। উট পাঁচ বছরের হতে হবে। গরু বা মহিষ দু বছরের হতে হবে। ছাগল, ভেড়া, দুম্বা হতে হবে এক বছর বয়সের।

[৩] কুরবানির পশু যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত হতে হবে। যেমন হাদিসে এসেছে:—

عن البراء بن عازب- رضى الله عنه- قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي،- وفي رواية: تجزىء - العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقى». [رواه الترمذي وفي رواية النسائي] ذكر [العجفاء] بدل [الكسيرة] وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي

সাহাবি আল-বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন তারপর বললেন: চার ধরনের পশু, যা দিয়ে কুরবানি জায়েয হবে না। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে পরিপূর্ণ হবে না—অন্ধ; যার অন্ধত্ব স্পষ্ট, রোগাক্রান্ত; যার রোগ স্পষ্ট, পঙ্গু; যার পঙ্গুত্ব স্পষ্ট এবং

আহত; যার কোনো অঙ্গ ভেঙ্গে গেছে। নাসায়ির বর্ণনায় 'আহত' শব্দের স্থলে 'পাগল' উল্লেখ আছে।[34]

আবার পশুর এমন কতগুলো ত্রুটি আছে যা থাকলে কুরবানি আদায় হয় কিন্তু মাকরূহ হবে। এ সকল দোষত্রুটি যুক্ত পশু কুরবানি না করা ভাল। সে ত্রুটিগুলো হল শিং ভাঙ্গা, কান কাটা, লেজ কাটা, ওলান কাটা, লিঙ্গ কাটা ইত্যাদি।

[৪] যে পশুটি কুরবানি করা হবে তার উপর কুরবানি দাতার পূর্ণ মালিকানা সত্ত্ব থাকতে হবে। বন্ধকি পশু, কর্জ করা পশু বা পথে পাওয়া পশু দ্বারা কুরবানি আদায় হবে না।

কুরবানির ওয়াক্ত বা সময়:

কুরবানি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত একটি ইবাদত। এ সময়ের পূর্বে যেমন কুরবানি আদায় হবে না তেমনি পরে করলেও আদায় হবে না।

যারা ঈদের সালাত আদায় করবেন তাদের জন্য কুরবানির সময় শুরু হবে ঈদের সালাত আদায় করার পর থেকে। যদি ঈদের

---

[34] তিরমিযি, হাদিস: ১৫৪৬, নাসায়ী: ৪৩৭১

সালাত আদায়ের পূর্বে কুরবানির পশু যবেহ করা হয় তাহলে কুরবানি আদায় হবে না। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن البراء بن عازب -رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: «إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا، أن نصلى ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل أن يصلي فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء». [رواه البخاري]

আল-বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবাতে বলেছেন: এ দিনটি আমরা শুরু করব সালাত দিয়ে। অতঃপর সালাত থেকে ফিরে আমরা কুরবানি করব। যে এমন আমল করবে সে আমাদের আদর্শ সঠিকভাবে অনুসরণ করল। আর যে এর পূর্বে যবেহ করল সে তার পরিবারবর্গের জন্য গোশতের ব্যবস্থা করল। কুরবানির কিছু আদায় হল না।[35]

সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে কুরবানি পশু যবেহ না করে সালাতের খুতবা দুটি শেষ হওয়ার পর যবেহ করা ভাল। কেননা

[35] বুখারি: ৯৬৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকম করেছেন। হাদিসে এসেছে—

قال جندب بن سفيان البجلي -رضى الله عنه-: صلى النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب ثم ذبح ... [رواه البخاري]

সাহাবি জুনদাব ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী রা. বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির দিন সালাত আদায় করলেন অতঃপর খুতবা দিলেন তারপর পশু যবেহ করলেন।[36]

عن جندب بن سفيان قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح.» [رواه البخاري]

জুনদুব ইবনে সুফিয়ান বলেন, আমি কুরবানির দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে যবেহ করেছে সে যেন আবার অন্য স্থানে যবেহ করে। আর যে যবেহ করেনি সে যেন যবেহ করে।[37]

আর কুরবানির সময় শেষ হবে যিলহজ মাসের তেরো তারিখের সূর্যাস্তের সাথে সাথে। অতএব কুরবানির পশু যবেহ করার সময় হল

---

[36] বুখারি, হাদিস: ৯৮৫

[37] বুখারি, হাদিস: ৫৫৬২

চার দিন। যিলহজ মাসের দশ, এগারো, বার ও তেরো তারিখ। এটাই উলামায়ে কেরামের নিকট সর্বোত্তম মত হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ:

এক. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন:—

﴿ لِّيَشْهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۖ ﴾ [الحج : ٢٨]

‘যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদের চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিজিক হিসেবে দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।’[38]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারি রহ. বলেন: ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন: ‘এ আয়াতে নির্দিষ্ট দিনগুলো বলতে বুঝায় কুরবানির দিন ও তার পরবর্তী তিন দিন।’

অতএব এ দিনগুলো আল্লাহ তা‘আলা কুরবানির পশু যবেহ করার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:—

---

[38] সূরা আল-হজ, আয়াত: ২৮

كل أيام التشريق ذبح. [رواه أحمد، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة]

'আইয়ামে তাশরীকের প্রতিদিন যবেহ করা যায়।'[39] আইয়ামে তাশরীক বলতে কুরবানির পরবর্তী তিন দিনকে বুঝায়।

তিন. কুরবানির পরবর্তী তিন দিনে সওম পালন জায়েয নয়। এ দ্বারা বুঝে নেয়া যায় যে এ তিন দিনে কুরবানি করা যাবে।

চার. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আইয়ামে তাশরীক হল খাওয়া, পান করা ও আল্লাহর জিকির করার দিন।'

এ দ্বারা বুঝে নিতে পারি যে, যে দিনগুলো আল্লাহ খাওয়ার জন্য নির্ধারণ করেছেন সে দিনগুলোতে কুরবানির পশু যবেহ করা যেতে পারে।

পাঁচ. সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত হয়, কুরবানির পরবর্তী তিনদিন কুরবানির পশু যবেহ করা যায়।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন: আলী ইবনে আবি তালেব রা. বলেছেন: 'কুরবানির দিন হল ঈদুল আজহার দিন ও তার পরবর্তী তিন দিন।' অধিকাংশ ইমাম ও আলেমদের এটাই মত। যারা বলেন,

[39] বর্ণনায় আহমদ, হাদিস: ৪/৮২

কুরবানির দিন হল মোট তিন দিন; যিলহজ মাসের দশ, এগারো ও বার তারিখ, বার তারিখের পর যবেহ করলে কুরবানি হবে না, তাদের কথার সমর্থনে কোনো প্রমাণ নেই ও মুসলিমদের ঐক্যমত্য [ইজমা] প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

মৃত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানি

মূলত কুরবানির প্রচলন জীবিত ব্যক্তিদের জন্য। যেমন আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিগণ নিজেদের পক্ষে কুরবানি করেছেন। অনেকের ধারণা কুরবানি শুধু মৃত ব্যক্তিদের জন্য করা হবে। এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। তবে মৃত ব্যক্তিদের জন্য কুরবানি করা জায়েয ও একটি সওয়াবের কাজ। কুরবানি একটি সদকা। আর মৃত ব্যক্তির নামে যেমন সদকা করা যায় তেমনি তার নামে কুরবানিও দেয়া যায়।

যেমন মৃত ব্যক্তির জন্য সদকার বিষয়ে হাদিসে এসেছে—

عن عائشة- رضى الله عنها- أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصى، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال: « نعم » . [رواه البخاري ومسلم]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—হে রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। কোনো অসিয়ত করে যেতে পারেন নি। আমার মনে হয় তিনি কোনো কথা বলতে পারলে অসিয়ত করে যেতেন। আমি যদি এখন তার পক্ষ থেকে সদকা করি তাতে কি তার সওয়াব হবে ? তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ।[40]

মৃত ব্যক্তির জন্য এ ধরনের সদকা ও কল্যাণমূলক কাজের যেমন যথেষ্ট প্রয়োজন ও তেমনি তা তাঁর জন্য উপকারী।

এমনিভাবে একাধিক মৃত ব্যক্তির জন্য সওয়াব প্রেরণের উদ্দেশ্যে একটি কুরবানি করা জায়েয আছে। অবশ্য যদি কোনো কারণে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানি ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য পূর্ণ একটি কুরবানি করতে হবে।

অনেক সময় দেখা যায়, ব্যক্তি নিজেকে বাদ দিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানি করেন। এটা মোটেই ঠিক নয়। ভাল কাজ নিজেকে দিয়ে শুরু করতে হয় তারপর অন্যান্য জীবিত ও মৃত ব্যক্তির জন্য করা যেতে পারে। যেমন হাদিসে এসেছে—

---

[40] বুখারি: ১৩৩৮,২৭৬০, মুসলিম: ১০৪।

عن عائشة وأبي هريرة -رضى الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي، اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، [مخصيين] فذبح أحدهما عن أمته، لمن شهد لله بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، وذبح آخر عن محمد، وعن آل محمد- صلى الله عليه وسلم- .[صحيح ابن ماجة [صححه الألباني]

আয়েশা রা. ও আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরবানি দিতে ইচ্ছা করলেন তখন দুটো দুম্বা ক্রয় করলেন। যা ছিল বড়, হৃষ্টপুষ্ট, শিং ওয়ালা, সাদা-কালো বর্ণের এবং খাসি। একটি তিনি তার ঐ সকল উম্মতের জন্য কুরবানি করলেন; যারা আল্লাহর একত্ববাদ ও তার রাসূলের রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে, অন্যটি তার নিজের ও পরিবার বর্গের জন্য কুরবানি করেছেন।[41]

মৃত ব্যক্তি যদি তার সম্পদ থেকে কুরবানি করার অসিয়ত করে যান তবে তার জন্য কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

অংশীদারির ভিত্তিতে কুরবানি করা কুরবানি:

যাকে 'শরীকে কুরবানি দেয়া' বলা হয়।

[41] ইবনে মাজা, হাদিস: ২৫৩১

ভেড়া, দুম্বা, ছাগল দ্বারা এক ব্যক্তি একটা কুরবানি করতে পারবেন। আর উট, গরু, মহিষ দ্বারা সাত জনের পক্ষ থেকে সাতটি কুরবানি করা যাবে। ইতোপূর্বে জাবের রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে।

অংশীদারি ভিত্তিতে কুরবানি করার দুটি পদ্ধতি হতে পারে:

[এক] সওয়াবের ক্ষেত্রে অংশীদার হওয়া। যেমন কয়েক জন মুসলিম মিলে একটি বকরি ক্রয় করল। অতঃপর একজনকে ঐ বকরির মালিক বানিয়ে দিল। বকরির মালিক বকরিটি কুরবানি করল। যে কজন মিলে বকরি খরিদ করেছিল সকলে সওয়াবের অংশীদার হল।

[দুই] মালিকানার অংশীদারির ভিত্তিতে কুরবানি। দু জন বা ততোধিক ব্যক্তি একটি বকরি কিনে সকলেই মালিকানার অংশীদার হিসেবে কুরবানি করল। এ অবস্থায় কুরবানি শুদ্ধ হবে না। অবশ্য উট, গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি জায়েয আছে।

মনে রাখতে হবে কুরবানি হল একটি ইবাদত ও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য লাভের উপায়। তাই তা আদায় করতে হবে সময়, সংখ্যা ও পদ্ধতিগত দিক দিয়ে শরিয়ত অনুমোদিত নিয়মাবলী

অনুসরণ করে। কুরবানির উদ্দেশ্য শুধু গোশত খাওয়া নয়, শুধু মানুষের উপকার করা নয় বা শুধু সদকা [দান] নয়। কুরবানির উদ্দেশ্য হল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটি মহান নিদর্শন তার রাসূলের নির্দেশিত পদ্ধতিতে আদায় করা।

তাই, আমরা দেখলাম কীভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশতের বকরি ও কুরবানির বকরির মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করলেন। তিনি বললেন যা সালাতের পূর্বে যবেহ হল তা বকরির গোশত আর যা সালাতের পরে যবেহ হল তা কুরবানির গোশত।

কুরবানি দাতা যে সকল কাজ থেকে দূরে থাকবেন:

যখন কেউ কুরবানি পেশ করার ইচ্ছা করে আর যিলহজ মাস প্রবেশ করে। তার জন্য চুল, নখ অথবা চামড়ার কোনো অংশ কাটা থেকে বিরত থাকবে, যতক্ষণ না কুরবানি করবে।

হাদিসে এসেছে—

عن أم سلمة- رضى الله عنها- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: « إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» .

[رواه مسلم] وفي رواية له: « فلا يمس من شعره وبشره شيئا »، وفي رواية: حتى يضحي.

উম্মে সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের মাঝে যে কুরবানি করার ইচ্ছে করে সে যেন যিলহজ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে। ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তার অন্য একটি বর্ণনায় আছে—'সে যেন চুল ও চামড়া থেকে কোনো কিছু স্পর্শ না করে। অন্য বর্ণনায় আছে 'কুরবানির পশু যবেহ করার পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবে।'[42]

কুরবানি দাতার পরিবারের লোক জনের নখ, চুল ইত্যাদি কাঁটাতে কোনো সমস্যা নেই।

কোন কুরবানি দাতা যদি তার চুল, নখ অথবা চামড়ার কোনো অংশ কেটে ফেলে তার জন্য উচিত তাওবা করা, পুনরাবৃত্তি না করা, তবে এ জন্য কোনো কাফফারা নেই এবং এ জন্য কুরবানিতে কোনো সমস্যা হবে না। আর যদি ভুলে, অথবা না জানার কারণে অথবা অনিচ্ছাসত্বে কোনো চুল পড়ে যায়, তার কোনো গুনাহ হবে

[42] মুসলিম: ১৯৭৭

না। আর যদি সে কোনো কারণে তা করতে বাধ্য হয়, তাও তার জন্য জায়েয, এ জন্য তার কোনো কিছু প্রদান করতে হবে না। যেমন নখ ভেঙ্গে গেল, ভাঙ্গা নখ তাকে কষ্ট দিচ্ছে সে তা কর্তন করতে পারবে, তদ্রূপ কারো চুল লম্বা হয়ে চোখের উপর চলে আসছে সেও চুল কাটতে পারবে অথবা কোনো চিকিৎসার জন্যও চুল ফেলতে পারবে।

কুরবানি দাতা চুল ও নখ না কাটার নির্দেশে কি হিকমত রয়েছে এ বিষয়ে উলামায়ে কেরাম অনেক কথা বলেছেন। অনেকে বলেছেন: কুরবানি দাতা হজ করার জন্য যারা এহরাম অবস্থায় রয়েছেন তাদের আমলে যেন শরিক হতে পারেন, তাদের সাথে একাত্মতা বজায় রাখতে পারেন।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেছেন: ‘কুরবানি দাতা চুল ও নখ বড় করে তা যেন পশু কুরবানি করার সাথে সাথে নিজের কিছু অংশ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানি [ত্যাগ] করায় অভ্যস্ত হতে পারেন এজন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।’ যদি কেউ যিলহজ মাসের প্রথম দিকে কুরবানি করার ইচ্ছা না করে বরং কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর কুরবানির নিয়ত করল সে কি

করবে? সে নিয়ত করার পর থেকে কুরবানির পশু যবেহ পর্যন্ত চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকবে।

কুরবানির পশু যবেহ করার নিয়মাবলী:

কুরবানি দাতা নিজের কুরবানির পশু নিজেই যবেহ করবেন, যদি তিনি ভালভাবে যবেহ করতে পারেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যবেহ করেছেন। আর যবেহ করা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের একটি মাধ্যম। তাই প্রত্যেকের নিজের কুরবানি নিজে যবেহ করার চেষ্টা করা উচিত।

ইমাম বুখারি রহ. বলেছেন: 'সাহাবি আবূ মুসা আশ'আরী রা. নিজের মেয়েদের নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন নিজ হাতে নিজেদের কুরবানির পশু যবেহ করেন।' তার এ নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত হয় মেয়েরা কুরবানির পশু যবেহ করতে পারেন। তবে কুরবানি পশু যবেহ করার দায়িত্ব অন্যকে অর্পণ করা জায়েয আছে। কেননা সহিহ মুসলিমের হাদিসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টিটি কুরবানির পশু নিজ হাতে যবেহ করে বাকিগুলো যবেহ করার দায়িত্ব আলী রা.-কে অর্পণ করেছেন।

যবেহ করার সময় যে সকল বিষয় লক্ষণীয়:

[১] যা যবেহ করা হবে তার সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে, তাকে আরাম দিতে হবে। যাতে সে কষ্ট না পায় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। হাদিসে এসেছে—

عن شداد بن أوس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم، فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته». [رواه مسلم]

সাহাবি শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল বিষয়ে সকলের সাথে সুন্দর ও কল্যাণকর আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তোমরা যখন হত্যা করবে তখন সুন্দরভাবে করবে আর যখন যবেহ করবে তখনও তা সুন্দরভাবে করবে। তোমাদের একজন যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং যা যবেহ করা হবে তাকে যেন প্রশান্তি দেয়।[43]

[২] যদি উট যবেহ করতে হয় তবে তা নহর করবে। নহর হল উটটি তিন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে আর সম্মুখের বাম পা বাধা

---

[43] মুসলিম: ১৯৫৫

থাকবে। তার বুকে ছুরি চালানো হবে। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন:—

﴿ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ ﴿٣٦﴾ ﴾ [الحج : ٣٦]

'সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর।'[44]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন: এর অর্থ হল তিন পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আর সামনের বাম পা বাধা থাকবে।

উট ছাড়া অন্য জন্তু হলে তা তার বাম কাতে শোয়াবে। ডান হাত দিয়ে ছুরি চালাবে। বাম হাতে জন্তুর মাথা ধরে রাখবে। মোস্তাহাব হল যবেহকারী তার পা জন্তুটির ঘারে রাখবে। যেমন ইতিপূর্বে আনাস রা. বর্ণিত বুখারির হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে।

[৩] যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হবে। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন:—

﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَٰتِهِۦ مُؤۡمِنِينَ ﴿١١٨﴾﴾ [الانعام: ١١٨]

---

[44] সূরা হজ, আয়াত: ৩৬

‘যার উপর আল্লাহর নাম [বিসমিল্লাহ] উচ্চারণ করা হয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর।’[45] যবেহ করার সময় তাকবীর বলা মোস্তাহাব। যেমন হাদিসে এসেছে:—

عن جابر رضى الله عنه ... وأتى بكبش ذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: «بِسْمَ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُمَّ هَذَا عَنِّيْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِيْ ».
[رواه أبو داود وصححه الألباني]

জাবের রা. থেকে বর্ণিত... একটি দুম্বা আনা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং বললেন ‘বিসমিল্লাহ ওয়া আল্লাহু আকবর, হে আল্লাহ ! এটা আমার পক্ষ থেকে। এবং আমার উম্মতের মাঝে যারা কুরবানি করতে পারেনি তাদের পক্ষ থেকে।’ অন্য হাদিসে এসেছে—

ضحى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنين، ويسمى ويكبر. [سنن الدارمي وسنده صحيح.]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি শিং ওয়ালা ভেড়া যবেহ করলেন, তখন বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বললেন।[46] যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর পাঠের পর— اللّٰهُمَّ هَذَا

---

[45] সূরা আনআম, আয়াত: ১১৮

[46] দারমী: ১৯৮৮

مِنْكَ وَلَكَ—[হে আল্লাহ এটা তোমার তরফ থেকে, তোমারই জন্য] বলা যেতে পারে। যার পক্ষ থেকে কুরবানি করা হচ্ছে তার নাম উল্লেখ করে দোয়া করা জায়েয আছে। এ ভাবে বলা—'হে আল্লাহ তুমি অমুকের পক্ষ থেকে কবুল করে নাও।' যেমন হাদিসে এসেছে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির দুম্বা যবেহ করার সময় বললেন:—

«بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ » [رواه مسلم]

'আল্লাহ নামে, হে আল্লাহ! আপনি মোহাম্মদ ও তার পরিবার-পরিজন এবং তার উম্মতের পক্ষ থেকে কবুল করে নিন।'[47]

কুরবানির গোশত কারা খেতে পারবেন:

কুরবানির গোসত কুরবানি দাতা নিজে খাবেন, ফকির মিসকিনকে দান করবেন এবং আত্মীয় স্বজনদের উপহার হিসেবে দিতে পারবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন:—

﴿ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ﴾ [الحج : ٢٨]

---

[47] মুসলিম: ১৯৬৭

‘অতঃপর তোমরা উহা হতে আহার কর এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।’[48] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানির গোশত সম্পর্কে বলেছেন:—

«كلوا وأطعموا وادخروا».رواه البخاري من حديث سلمة ابن الأكوع .

‘তোমরা নিজেরা খাও ও অন্যকে আহার করাও এবং সংরক্ষণ কর।’[49]

‘আহার করাও’ বাক্য দ্বারা অভাবগ্রস্তকে দান করা ও ধনীদের উপহার হিসেবে দেয়াকে বুঝায়। কতটুকু নিজেরা খাবে, কতটুকু দান করবে আর কতটুকু উপহার হিসেবে প্রদান করবে এর পরিমাণ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ও হাদিসে কিছু বলা হয়নি। তাই উলামায়ে কেরাম বলেছেন: কুরবানির গোশত তিন ভাগ করে একভাগ নিজেরা খাওয়া, এক ভাগ দরিদ্রদের দান করা ও এক ভাগ উপহার হিসেবে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের দান করা মোস্তাহাব।

কুরবানির গোশত যতদিন ইচ্ছা ততদিন সংরক্ষণ করে খাওয়া যাবে। ‘কুরবানির গোশত তিন দিনের বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না’—বলে

---

[48] সূরা হজ, আয়াত: ২৮

[49] বুখারি: ৫৫৬৯

যে হাদিস রয়েছে তার হুকুম রহিত হয়ে গেছে। তাই যতদিন ইচ্ছা ততদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

তবে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ বিষয়ে একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: সংরক্ষণ নিষেধ হওয়ার কারণ হল দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের সময় তিন দিনের বেশি কুরবানির গোশত সংরক্ষণ করা জায়েয হবে না। তখন 'সংরক্ষণ নিষেধ' সম্পর্কিত হাদিস অনুযায়ী আমল করতে হবে। আর যদি দুর্ভিক্ষ না থাকে তবে যতদিন ইচ্ছা কুরবানি দাতা কুরবানির গোশত সংরক্ষণ করে খেতে পারেন। তখন 'সংরক্ষণ নিষেধ রহিত হওয়া' সম্পর্কিত হাদিস অনুযায়ী আমল করা হবে।

কুরবানির পশুর গোশত, চামড়া, চর্বি বা অন্য কোনো কিছু বিক্রি করা জায়েয নয়। কসাই বা অন্য কাউকে পারিশ্রমিক হিসেবে কুরবানির গোশত দেয়া জায়েয নয়। হাদিসে এসেছে:—

ولا يعطى في جزارتها شيئا [رواه البخاري ومسلم]

'তার প্রস্তুত করণে তার থেকে কিছু দেয়া হবে না।[50]' তবে দান বা উপহার হিসেবে কসাইকে কিছু দিলে তা না-জায়েয হবে না।

---

[50] বুখারি: ১৭১৬, মুসলিম: ১৩১৭

আইয়ামুত-তাশরীক ও তার করণীয়:

আইয়ামুত-তাশরীক বলা হয় কুরবানির পরবর্তী তিন দিনকে। অর্থাৎ যিলহজ মাসের এগারো, বারো ও তেরো তারিখকে আইয়ামুত-তাশরীক বলা হয়। তাশরীক শব্দের অর্থ শুকানো। মানুষ এ দিনগুলোতে গোশত শুকাতে দিয়ে থাকে বলে এ দিনগুলোর নাম 'আইয়ামুত-তাশরীক' বা 'গোশত শুকানোর দিন' নামে নামকরণ করা হয়েছে।

আইয়ামুত তাশরীক এর ফযিলত

এ দিনগুলোর ফযিলত সম্পর্কে যে সকল বিষয় এসেছে তা নীচে আলোচনা করা হল:—

[১] এ দিনগুলো ইবাদত-বন্দেগি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিকির ও তার শুকরিয়া আদায়ের দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:—

﴿ ۞وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ ﴿٢٠٣﴾ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]

'তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করবে।'[51] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারি রহ. বলেন:—

---

[51] সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২০৩

عن أبن عباس رضى الله عنهما ... الأيام المعدودات: أيام التشريق. [البخاري، كتاب العيدين]

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন—'নির্দিষ্ট দিনগুলো বলতে আইয়ামুত-তাশরীককে বুঝানো হয়েছে।'

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন: ইবনে আব্বাসের এ ব্যাখ্যা গ্রহণে কারো কোনো দ্বি-মত নেই। আর মূলত এ দিনগুলো হজের মওসুমে মিনাতে অবস্থানের দিন। কেননা হাদিসে এসেছে—

...أيام منى ثلاثة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. [رواه أبو داود وصححه الألباني]

মিনায় অবস্থানের দিন হল তিন দিন। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দু দিনে চলে আসে তবে তার কোনো পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোনো পাপ নেই।[52] হাদিসে এসেছে—

عن نبيشة الهذلي أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «**أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله.**» [رواه مسلم]

[52] আবু দাউদ: ১৯৪৯

নাবীশা হাজালী থেকে বর্ণিত যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আইয়ামুত-তাশরীক হল খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যিকিরের দিন।'[53]

ইমাম ইবনে রজব রহ. এ হাদিসের ব্যাখ্যায় চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন: আইয়ামুত-তাশরীক এমন কতগুলো দিন যাতে ঈমানদারদের দেহের নেয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং মনের নেয়ামত তথা স্বাচ্ছন্দ্য একত্র করা হয়েছে। খাওয়া- দাওয়া হল দেহের খোরাক আর আল্লাহর জিকির ও শুকরিয়া হল হৃদয়ের খোরাক। আর এভাবেই নেয়ামতের পূর্ণতা লাভ করল এ দিনসমূহে।

[২] আইয়ামুত-তাশরীকের দিনগুলো ঈদের দিন হিসেবে গণ্য। যেমন হাদিসে এসেছে—

عن عقبة بن عامر- رضى الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» .

[رواه أبو داود وصححه الألباني]

'সাহাবি উকবাহ ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আরাফাহ দিবস,

---

[53] মুসলিম: ১১৪১

কুরবানির দিন ও মিনার দিনসমূহ [কুরবানি পরবর্তী তিন দিন] আমাদের ইসলাম অনুসারীদের ঈদের দিন।'[54]

[৩] এ দিনসমূহ যিলহজ মাসের প্রথম দশকের সাথে লাগানো। যে দশক খুবই ফযিলত পূর্ণ। তাই এ কারণেও এর যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে।

[৪] এ দিনগুলোতে হজের কতিপয় আমল সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এ কারণেও এ দিনগুলো ফযিলতের অধিকারী।

আইয়ামুত তাশরীকে করণীয়:

এ দিনসমূহ যেমনি ইবাদত-বন্দেগি, জিকির-আযকারের দিন তেমনি আনন্দ-ফুর্তি করার দিন। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আইয়ামুত-তাশরীক হল খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহর যিকিরের দিন।'

এ দিনগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেয়া নেয়ামত নিয়ে আমোদ-ফুর্তি করার মাধ্যমে তার শুকরিয়া ও জিকির আদায় করা। জিকির আদায়ের কয়েকটি পদ্ধতি হাদিসে এসেছে।

[54] আবু দাউদ: ২৪১৩

[১] সালাতের পর তাকবীর পাঠ করা। এবং সালাত ছাড়াও সর্বদা তাকবীর পাঠ করা। এ তাকবীর আদায়ের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ দিতে পারি যে এ দিনগুলো আল্লাহর যিকিরের দিন। আর এ যিকিরের নির্দেশ যেমন হাজীদের জন্য তেমনই যারা হজ পালন রত নন তাদের জন্যও।

[২] কুরবানি ও হজের পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ তা'আলার নাম ও তাকবীর উচ্চারণ করা।

[৩] খাওয়া-দাওয়ার শুরু ও শেষে আল্লাহ তা'আলার জিকির করা। আর এটা তো সর্বদা করার নির্দেশ রয়েছে তথাপি এ দিনগুলোতে এর গুরুত্ব বেশি দেয়া। এমনিভাবে সকল কাজ ও সকাল-সন্ধ্যার জিকিরগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া।

[৪] হজ পালন অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহ তা'আলার তাকবীর পাঠ করা।

[৫] এ গুলো ছাড়াও যে কোনো সময় ও যে কোনো অবস্থায় আল্লাহর জিকির করা।

ঈদুল আজহার বিধান:

মুসলিম ভাই, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করছি যে, তিনি তোমাকে দীর্ঘজীবি করেছেন, যার ফলে তুমি আজকের এ দিনগুলোতে উপনীত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার জন্য ইবাদত ও নেক আমল করার সুযোগ পেয়েছ।

ঈদ এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য এবং দীনের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। তোমার দায়িত্ব এটা গুরুত্ব ও সম্মানসহ গ্রহণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ ٣٢﴾ [الحج : ٣٢]

এটাই হল আল্লাহর বিধান; যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান **করে**। নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই।[55]

ঈদের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কিছু আদব ও আহকাম:

১. তাকবীর: আরাফার দিনের ফজর থেকে শুরু করে তাশরীকের দিনের শেষ পর্যন্ত, তথা যিলহজ মাসের তেরো তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবীর বলা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ ٢٠٣﴾ [البقرة: ٢٠٣]

[55] সূরা হজ, আয়াত: ৩২

“আর তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর নির্দিষ্ট দিনসমূহে।”[56] তাকবীর বলার পদ্ধতি:

"الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد"

আল্লাহর যিকির বুলন্দ ও সর্বত্র ব্যাপক করার নিয়তে পুরুষদের জন্য মসজিদ, বাজার, বাড়িতে ও সালাতের পশ্চাতে উচ্চ স্বরে তাকবীর পাঠ করা সুন্নত।

২. কুরবানি করা: ঈদের দিন ঈদের সালাতের পর কুরবানি করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح» [رواه البخاري ومسلم].

যে ব্যক্তি ঈদের আগে যবেহ করল, তার উচিত তার জায়গায় আরেকটি কুরবানি করা। আর যে এখনো কুরবানি **করেনি,** তার উচিত এখন কুরবানি করা।[57]

কুরবানি করার সময় চার দিন। অর্থাৎ নহরের দিন এবং তার পরবর্তী তাশরীকের তিন দিন। যেহেতু রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

---

[56] বাকারা: ২০৩

[57] বুখারী ও মুসলিম

«كل أيام التشريق ذبح» انظر السلسلة الصحيحة

"তাশরীকের দিন কুরবানির দিন।[58]

৩. পুরুষদের জন্য গোসল করা ও সুগন্ধি মাখা: সুন্দর কাপড় পরিধান করা, টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান না করা, কাপড়ের ক্ষেত্রে অপচয় না করা। দাঁড়ি না মুণ্ডানো, এটা হারাম। নারীদের জন্য ঈদগাহে যাওয়া বৈধ, তবে আতর ও সৌন্দর্য প্রদর্শন পরিহার করবে। মুসলিম নারীদের জন্য কখনো শোভা পায় না যে সে আল্লাহর ইবাদতের জন্য তাঁরই গুনাহতে লিপ্ত হয়ে ধর্মীয় কোনো ইবাদতে অংশ গ্রহণ করবে। যেমন, সৌন্দর্য প্রদর্শন, সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি করে ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া।

বস্তুত ঈদের দিন গোসল করার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা মোস্তাহাব। কেননা এ দিনে সকল মানুষ সালাত আদায়ের জন্য মিলিত হয়। যে কারণে জুমার দিন গোসল করা মোস্তাহাব সে কারণেই ঈদের দিন ঈদের সালাতের পূর্বে গোসল করাও মোস্তাহাব। হাদিসে এসেছে—

---

[58] সহীহ হাদিস সমগ্র: ২৪৬৭

صح عن ابن عمر- رضى الله عنهما- أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. رواه الإمام مالك في أول كتاب العيدين وقال سعيد بن المسيب سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال.] إرواء الغليل للألباني[

ইবনে উমর রা. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, তিনি ঈদুল-ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন।[59] সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াব রহ. বলেন: ঈদুল ফিতরের সুন্নত তিনটি: ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া, ঈদগাহের দিকে রওয়ানার পূর্বে কিছু খাওয়া, গোসল করা। এমনি ভাবে সুগন্ধি ব্যবহার ও উত্তম পোশাক পরিধান করা মোস্তাহাব।[60]

৪. কুরবানির গোস্ত ভক্ষণ করা। ঈদুল আজহার দিন রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা খেতেন না, যতক্ষণ না তিনি ঈদগাহ থেকে ফিরে আসতেন, অতঃপর তিনি কুরবানি গোস্ত থেকে ভক্ষণ করতেন।

তাই সুন্নত হল ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে খাবার গ্রহণ করা। আর ঈদুল আযহা-তে ঈদের সালাতের পূর্বে

---

[59] মুয়াত্তা মালেক: ১/১৭৭

[60] এরওয়ায়ুল গালীল: ২/১০৪

কিছু না খেয়ে সালাত আদায়ের পর কুরবানির গোশত খাওয়া সুন্নত। হাদিসে এসেছে—

عن بريدة- رضى الله عنه- قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، فيأكل من أضحيته. [رواه أحمد، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه]

বুরাই-দা রা. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিনে না খেয়ে বের হতেন না, আর ঈদুল আজহার দিনে ঈদের সালাতের পূর্বে খেতেন না। সালাত থেকে ফিরে এসে কুরবানির গোশত খেতেন।[61]

৫. সম্ভব হলে পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া: ঈদগাহতেই সালাত আদায় করা সুন্নত। তবে বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে মসজিদে পড়া বৈধ, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পড়েছেন।

ঈদগাহে তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত। যাতে ইমাম সাহেবের নিকটবর্তী স্থানে বসা যায় ও ভাল কাজ অতি তাড়াতাড়ি করার সওয়াব অর্জন করা যায়, সাথে সাথে সালাতের অপেক্ষায় থাকার

[61] সহীহ ইবনে মাজাহ: হাদিস: ১৪২২

সওয়াব পাওয়া যাবে। ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া হল মোস্তাহাব। হাদিসে এসেছে—

عن علي- رضى الله عنه- قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه وقال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا، وأن لا يركب إلا بعذر.[حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي]

আলী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সুন্নত হল ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া। ইমাম তিরমিযি হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন হাদিসটি হাসান। তিনি আরও বলেন: অধিকাংশ আলেম এ অনুযায়ী আমল করেন। এবং তাদের মত হল পুরুষ ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাবে, এটা মোস্তাহাব। আর গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ ছাড়া যানবাহনে আরোহণ করবে না।[62]

৬. মুসলিমদের সাথে সালাত আদায় করা এবং খুতবায় অংশ গ্রহণ করা: উলামায়ে কেরামদের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, ঈদের সালাত ওয়াজিব। এটাই ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

---

[62] তিরমিযি: ৪৩৭

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢ ﴾ [الكوثر: ٢]

"অতএব তোমরা রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড় এবং নহর কর"।[63]

উপযুক্ত কোনো কারণ ছাড়া ঈদের সালাতের ওয়াজিব রহিত হবে না। মুসলিমদের সাথে নারীরাও ঈদের সালাতে হাজির **হবে**। এমনকি ঋতুমতী নারী ও যুবতী মেয়েরাও। তবে ঋতুমতী নারীরা ঈদগাহ থেকে দূরে অবস্থান করবে।

৭. রাস্তা পরিবর্তন করা: এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যাওয়া ও অপর রাস্তা দিয়ে ঈদগাহ থেকে বাড়ি ফেরা মোস্তাহাব। যেহেতু তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।

আর একটি সুন্নত হল যে পথে ঈদগাহে যাবে সে পথে না ফিরে অন্য পথে ফিরে আসবে। যেমন হাদিসে এসেছে–

عن جابر- رضى الله عنه- قال: كان النبي إذا كان يوم العيد خالف الطريق. [رواه البخاري]

---

[63] কাউসার: ২

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে পথ বিপরীত করতেন।[64] অর্থাৎ যে পথে ঈদগাহে যেতেন সে পথে ফিরে না এসে অন্য পথে আসতেন।

৮. ঈদের সুভেচ্ছা জানানো: ঈদের দিন একে অপরকে সুভেচ্ছা বিনিময় করা: যেমন বলা:

تقبل الله منا ومنكم. أو تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

অর্থ: আল্লাহ আমাদের থেকে ও তোমাদের থেকে নেক আমলসমূহ কবুল করুন। বা এ ধরনের অন্য কিছু বলা।

একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানো, অভিবাদন করা মানুষের সুন্দর চরিত্রের একটি দিক। এতে খারাপ কিছু নেই। বরং এর মাধ্যমে একে অপরের জন্য কল্যাণ কামনা ও দোয়া করা যায়। পরস্পরের মাঝে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

ঈদ উপলক্ষে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানানো শরিয়ত অনুমোদিত একটি বিষয়। বিভিন্ন বাক্য দ্বারা এ শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। যেমন:—

---

[64] বুখারি: ৯৮৬

[ক] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেছেন: ‘যুবাইর ইবনে নফীর থেকে সঠিক সূত্রে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কেরাম ঈদের দিন সাক্ষাৎকালে একে অপরকে বলতেন—

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ

‘আল্লাহ তা‘আলা আমাদের ও আপনার ভাল কাজগুলো কবুল করুন।’

[খ] ঈদ মুবারক বলে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়।

[গ] প্রতি বছরই আপনারা ভাল থাকুন:—

كُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ

—বলা যায়।

এ ধরনের সকল মার্জিত বাক্যের দ্বারা শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। তবে প্রথমে উল্লেখিত বাক্য—

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ

—দ্বারা শুভেচ্ছা বিনিময় করা উত্তম। কারণ সাহাবায়ে কেরাম রা. এ বাক্য ব্যবহার করতেন ও এতে পরস্পরের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া রয়েছে। আর যদি কেউ সব

বাক্যগুলো দ্বারা শুভেচ্ছা বিনিময় করতে চায় তাতে অসুবিধা নেই। যেমন ঈদের দিন দেখা হলে বলবে—

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ ، كُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ، عِيْدُكَ مُبَارَكٌ

'আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার ও আপনার সৎ কর্মসমূহ কবুল করুন। সারা বছরই আপনারা সুখে থাকুন। আপনাকে বরকতময় ঈদের শুভেচ্ছা।'

এ দিনগুলোতে সাধারণ ঘটে যাওয়া কিছু বিদআত ও ভুল ভ্রান্তি থেকে সকলের সতর্ক থাকা জরুরী: যেমন:

১. সম্মিলিত তাকবীর বলা: এক আওয়াজে অথবা একজনের বলার পর সকলে সমস্বরে বলা থেকে বিরত থাকা।

২. ঈদের দিন হারাম-নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া: গান শোনা, ফিল্ম দেখা, বেগানা নারী-পুরুষের সাথে মেলামেশা করা ইত্যাদি পরিত্যাগ করা।

৩. কুরবানির পশু যবেহ করার পূর্বে চুল, নখ ইত্যাদি কর্তন করা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানি দাতাকে যিলহজ মাসের আরম্ভ থেকে কুরবানি করা পর্যন্ত তা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

৪. ঈদের দিনে কবর যিয়ারত করা: কবর যিয়ারত করা শরিয়ত সমর্থিত একটি নেক আমল। কিন্তু ঈদের দিনে কবর জিয়ারত করার কোনো বিশেষত্ব নেই। ঈদের দিন কবর যিয়ারত করাতে বিশেষ সাওয়াব আছে বলে বিশ্বাস করা বা ঈদের দিনে কবর যিয়ারতকে অভ্যাসে পরিণত করা বা একটা প্রথা বানিয়ে নেয়া শরিয়তসম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:—

«لا تجعلوا قبري عيداً »... [رواه أبو داود و صححه الألباني]

"তোমরা আমার কবরে ঈদ উদযাপন করবে না বা ঈদের স্থান বানাবে না..."।[65]

৫. গান-বাদ্য: ঈদের দিনে এ গুনাহের কাজটাও বেশি হতে দেখা যায়। গান ও বাদ্যযন্ত্র যে শরিয়তে নিষিদ্ধ এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আবার যদি হয় অশ্লীল গান তাহলে তো তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো ভিন্নমত নেই। হাদিসে এসেছে—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليكون أقواما من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ». رواه البخاري تعليقا بصورة الجزم

[65] আবু দাউদ: ২০৪২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার উম্মতের মাঝে এমন একটা দল পাওয়া যাবে যারা ব্যভিচার, রেশমি পোশাক, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল [বৈধ] মনে করবে।[66]

৬. পুরুষ কর্তৃক মহিলার বেশ-ধারণ করা ও মহিলা কর্তৃক পুরুষের বেশ ধারণ:

পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন ও সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রে পুরুষের মহিলার বেশ ধারণ ও মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম। ঈদের দিনে এ কাজটি অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। হাদিসে এসেছে—

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: « **أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء** ». رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সকল মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং ঐ সকল পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন যারা মহিলার বেশ ধারণ করে।[67]

---

[66] বুখারি: ৫৫৯০

[67] আবু দাউদ: ৪০৯৭

৭. অপচয় ও সীমালঙ্ঘন করা: এমন খরচ করা, যার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই, যার কোনো ফায়দা নেই, আর না আছে যার কোনো উপকার। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١ ﴾ [الانعام: ١٤١]

"আর তোমরা অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের ভালবাসেন না।"[68]

মুসলিম ভাইদের প্রতি আহ্বান:

আপনারা উপরে বর্ণিত নেক আমল ছাড়াও অন্যান্য নেক আমলের প্রতি যত্নশীল হোন। যেমন, আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করা, একে অপরকে মহব্বত করা এবং গরীব ও ফকীরদের উপর মেহেরবান হওয়া এবং আনন্দ উৎসবকে তাদের সাথে ভাগাভাগি করে নেওয়া ইত্যাদি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে তাঁর পছন্দনীয় কথা, কাজ ও আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত

---

[68] সূরা আনআম, আয়াত: ১৪১